উৎসর্গ

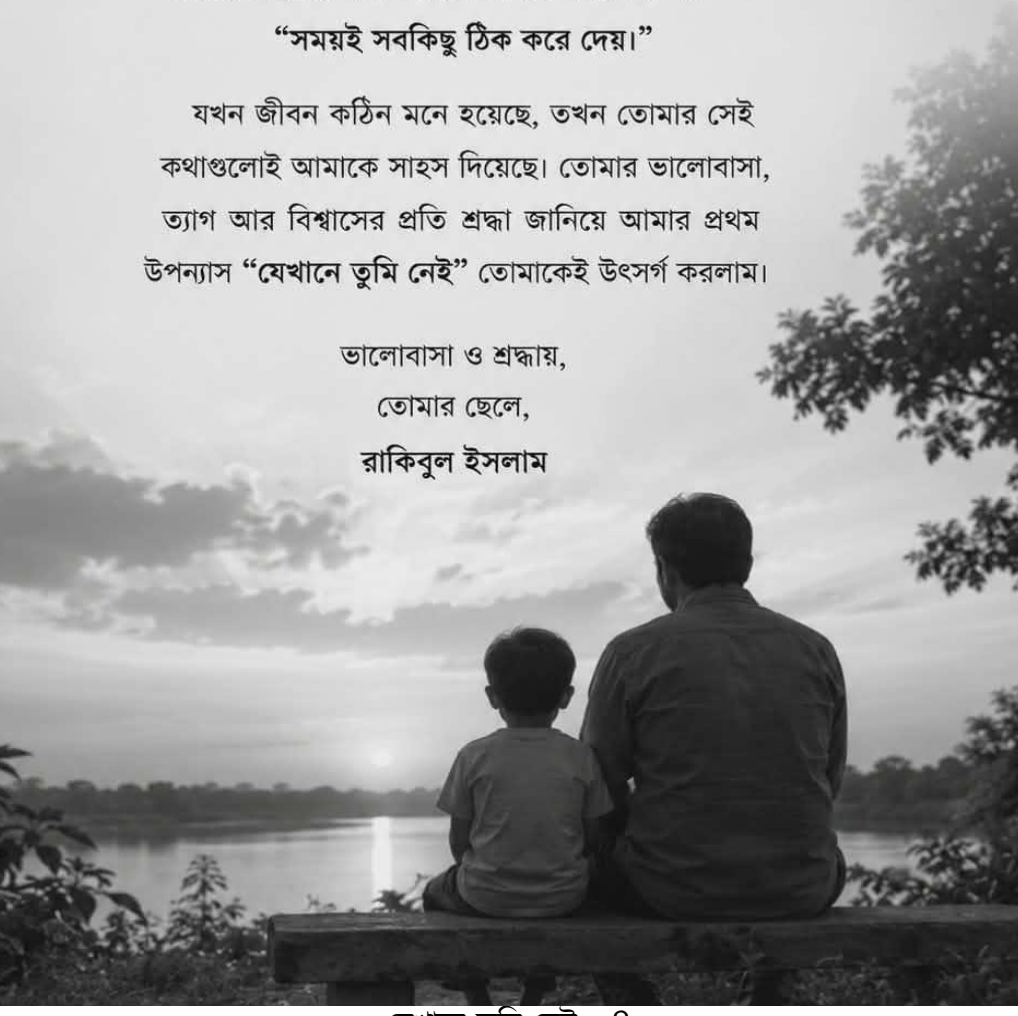
বাবাকে—

বাবা, তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষার সবটুকু হয়তো আমি পুরণ করতে পারিনি। ভালো ছেলে হওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সবসময় সফল হতে পারিনি। তবুও তোমার শেখানো একটি কথা আজও আমার পথচলার শক্তি—

“সময়ই সবকিছু ঠিক করে দেয়।”

যখন জীবন কঠিন মনে হয়েছে, তখন তোমার সেই কথাগুলোই আমাকে সাহস দিয়েছে। তোমার ভালোবাসা, ত্যাগ আর বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার প্রথম উপন্যাস **“যেখানে তুমি নেই”** তোমাকেই উৎসর্গ করলাম।

ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায়,
তোমার ছেলে,
রাকিবুল ইসলাম



অনুপ্রেরণা

সিনথিয়া জান্নাত নুপুর আপুকে—

জীবনের কিছু মানুষ কখনো গল্পের প্রধান চরিত্র হন না, কিন্তু গল্পটা শুরু হওয়ার পেছনে তাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি থাকে। আমার জীবনে সিনথিয়া জান্নাত নুপুর আপু তেমনই একজন মানুষ।

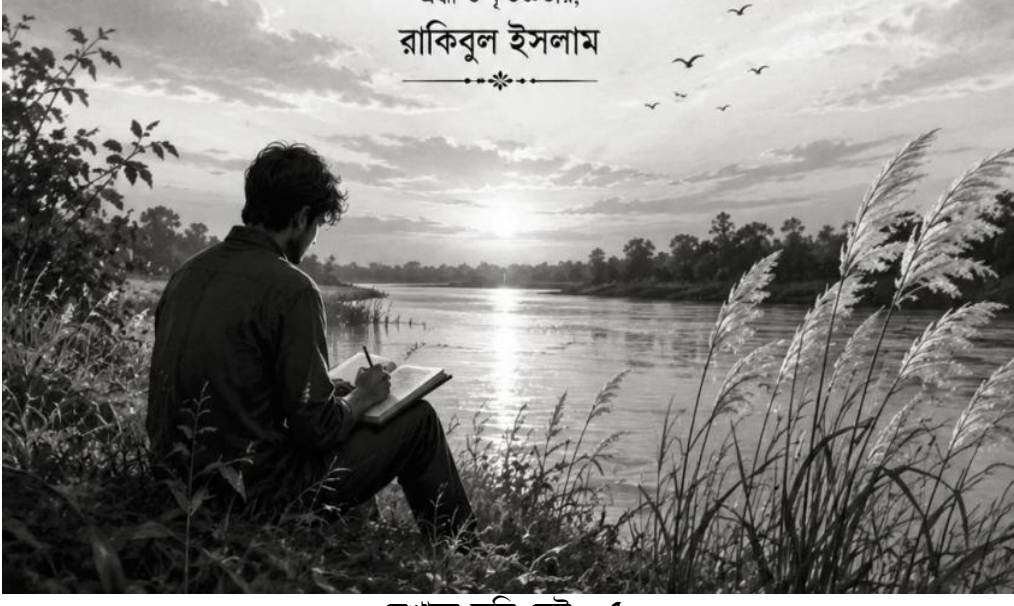
যখন আমি ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছিলাম, চারপাশের সবকিছু অর্থহীন মনে হতো, তখন আপুই আমাকে সাহস দিয়েছিলেন। তাঁর কথাগুলো আমাকে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে, হার না মানতে শিখিয়েছে। আমার ভেতরে লুকিয়ে থাকা লেখকসত্তাকে জাগিয়ে তোলার পেছনে তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার অবদান আমি কখনো ভুলতে পারব না।

হয়তো তিনি জানেন না, তাঁর কয়েকটি সাধারণ কথা আমার জীবনের অসাধারণ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। সেই শক্তি নিয়েই আমি কলম ধরেছি, শব্দের ভেতর নিজের অনুভূতিগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি।

"যেখানে তুমি নেই" উপন্যাসটি লেখার পেছনে তাঁর অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও শুভকামনা গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।

শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায়,

রাকিবুল ইসলাম



প্রকাশকের কথা

মানুষের জীবনে কিছু গল্প কখনো শেষ হয় না। কিছু মানুষ সময়ের স্রোতে হারিয়ে যায়, দূরত্বের আড়ালে মিলিয়ে যায় কিংবা জীবনের পথ বদলে অন্য কোথাও চলে যায়। অথচ তাদের রেখে যাওয়া স্মৃতি, অনুভূতি আর না বলা কথাগুলো হৃদয়ের গভীরে থেকে যায় আজীবন। কখনো নিঃশব্দে, কখনো অশ্রু হয়ে, আবার কখনো একাকী মুহূর্তের সঙ্গী হয়ে ফিরে আসে সেই পুরোনো দিনগুলো।

'যেখানে তুমি নেই'—নামটির মধ্যেই যেন লুকিয়ে আছে এক আকাশ শূন্যতা, এক বুক অভিমান আর হারিয়ে যাওয়া কাউকে ফিরে পাওয়ার নীরব আকাঙ্ক্ষা। রাকিবুল ইসলামের এই বইটি পাঠকের হৃদয়ে অনুভূতির এক ভিন্ন জানালা খুলে দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বই কেবল কিছু মলাটবন্দি পৃষ্ঠা নয়; বই হলো অনুভূতি প্রকাশের এক অনন্য আশ্রয়। কিছু লেখা পাঠককে হাসায়, কিছু লেখা কাঁদায়, আর কিছু লেখা নিজের জীবনের হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলোর সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই বইয়ের প্রতিটি অনুভূতি পাঠকের মনে নিজের মতো করে জায়গা করে নিক—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

একজন লেখকের স্বপ্নকে পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার মধ্যেই প্রকাশনার প্রকৃত আনন্দ। সেই আনন্দ ও দায়িত্ববোধ থেকেই বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। লেখকের সাহিত্যযাত্রা আরও সমৃদ্ধ হোক এবং পাঠকের ভালোবাসায় বইটি সার্থকতা লাভ করুক—এই কামনা করি।

পরিশেষে, সম্মানিত পাঠকদের প্রতি রইল আন্তরিক ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। আপনাদের পাঠ, অনুভূতি ও মূল্যবান মতামতই আমাদের আগামী দিনের পথচলার অনুপ্রেরণা।
ভালোবাসা অবিরাম, বইয়ের সঙ্গে থাকুন।

প্রকাশক
বইঝুলি



"কিছু মানুষ চলে যায়,কিন্তু তাদের রেখে যাওয়া স্মৃতিগুলো কোনোদিন চলে যায় না।"

কিছু মানুষ আমাদের জীবনে আসে খুব নিঃশব্দে। প্রথমে তারা হয়ে ওঠে পরিচিত, তারপর অভ্যাস, তারপর এমন এক অনুভূতি—যাকে ছাড়া নিজের অস্তিত্বটাকেও অসম্পূর্ণ মনে হয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, একসময় সেই মানুষটিই যখন দূরে চলে যায়, তখন পৃথিবীর সবকিছু আগের মতো থাকলেও নিজের ভেতরের পৃথিবীটা আর আগের মতো থাকে না।

মানুষ চলে যায়, সময় পেরিয়ে যায়, ঋতু বদলে যায়। শুধু কিছু স্মৃতি থেকে যায়—মনের এমন এক গোপন ঘরে, যেখানে অন্য কারও প্রবেশাধিকার নেই।

বিকেলের শেষ আলো তখন ধীরে ধীরে নদীর বুকে গড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিম আকাশে সূর্যটা হেলে পড়েছে অনেকটা, তার সোনালি আভা নদীর পানিতে ছড়িয়ে তৈরি করেছে অসংখ্য ছোট ছোট আলোর রেখা। নদীর ওপারে সবুজ গাছপালার সারি, মাঝে মধ্যে পাখিদের ঘরে ফেরার ব্যস্ততা, আর এপারে বাতাসে দুলতে থাকা কাশবনের নরম সাদা ফুল।

নদীর পাড়টা বেশ নিরিবিলি। দূরে কোথাও গরুর গলার ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে, কোথাও হয়তো কোনো মাঝি নৌকা বেয়ে বাড়ি

ফিরছে। চারপাশে গ্রামের চিরচেনা কোলাহল থাকলেও নদীর এই নির্জন অংশটুকু যেন অন্য এক পৃথিবী।

সেই পাড়েই পাশাপাশি বসে আছে রফিক আর শিলু।

রফিকের পরনে সাধারণ একটা শার্ট। চেহারায় বিশেষ কোনো আড়ম্বর নেই, নেই নিজেকে আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা। তার চোখে মুখে বরং একধরনের সরলতা, আর ঠোঁটের কোণে সব সময় লেগে থাকা সেই পরিচিত হাসি। কথায় কথায় মানুষকে হাসিয়ে দেওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার। নিজের জীবনের দুশ্চিন্তাগুলোও যেন সে হাসির আড়ালে লুকিয়ে রাখতে জানে।

অন্যদিকে শিলু বসে আছে তার পাশেই। বিকেলের বাতাসে তার চুলের কয়েকটি গোছা বারবার মুখের ওপর এসে পড়ছে। সে সেগুলো সরিয়ে কখনো নদীর দিকে তাকাচ্ছে, কখনো আড়চোখে রফিককে দেখছে।

রফিক অনেকক্ষণ ধরেই নদীর দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ পাশের মানুষটার দিকে ফিরে মৃদু স্বরে ডাকল,

শিলু... ওই শিলু!

শিলু নদীর দিক থেকে চোখ না সরিয়েই উত্তর দিল,

হুম, বলুন।

রফিক একটু হেসে বলল,

একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

করুন।

তুমি কি জন্ম থেকেই এমন?

এবার শিলু মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

কেমন?

এই যে, মানুষকে বিনা কারণে ধমক দেওয়া, কথায় কথায় রাগ করা, আর নিজের কথাটাকেই পৃথিবীর শেষ কথা মনে করা!

শিলু ভ্রু কুঁচকে তাকাল।

আমি আপনাকে ধমক দিই?

না, না! একদমই না। তুমি তো আমার জীবনের সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় মানুষ। তোমার সঙ্গে কথা বলার আগে আমার মনে হয়, কোনো পরীক্ষার হলে ঢুকছি। ভুল উত্তর দিলে কী শাস্তি হবে, সেই চিন্তায় থাকি।

শিলু আর রাগ ধরে রাখতে পারল না। হেসে ফেলল।

আপনি একটা অসহ্য মানুষ!

সেটা তো জানিই। কিন্তু তোমার মতো মহারানীর পাশে থাকার জন্য একটু অসহ্য হওয়া লাগে।

হাসতে হাসতেই শিলু হঠাৎ থেমে গেল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রফিক বুঝতে পারল, মেয়েটা কিছু একটা বলতে চাইছে।

শিলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল,

একটা কথা বলি?

বলো।

আমাকে শিলু বলবেন না।

রফিক অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

কেন? তোমার নাম তো শিলু।

তা জানি।

তা হলে?

শিলু এবার ঠোঁটের কোণে ছোট্ট একটা হাসি এনে বলল,

আমাকে সেই নামেই ডাকবেন, যেটা আপনি দিয়েছেন।

রফিক কিছুক্ষণ ভেবে দেখার ভান করল।

আমি আবার তোমাকে কত নামেই তো ডাকি! কোনটা বলছ?

যেটা শুনলে আমার ভালো লাগে।

ওহ্! বুঝেছি। তোমার রাজকীয় নামটা!

শিলু এবার একটু লজ্জা পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

হ্যাঁ, মহারানী।

রফিক হেসে বলল,

আচ্ছা, মহারানী!

শিলুর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। নামটা তার কাছে নিছক একটা সম্বোধন ছিল না। এই নামের মধ্যে মিশে ছিল রফিকের সঙ্গে তার একান্ত কিছু মুহূর্ত, কিছু অভিমান, আর এমন এক আপন অনুভূতি—যার ব্যাখ্যা সে নিজেও ঠিকমতো দিতে পারত না।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। নদীর পানিতে তখন আলো আরও ম্লান হয়ে এসেছে।

হঠাৎ রফিক বলল,

একটা কথা আছে।

শিলু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

আজ আর কী নতুন আইন জারি হবে?

আমাকে আপনি বলবে না।

শিলু তার দিকে তাকাল।

তাহলে কী বলব?

তুমি।

কী বললে?

তুমি । আমাকে তুমি করে বলবে।

শিলু একটু অবাক হওয়ার অভিনয় করে চারপাশে তাকাল।

কোথায়? এখানে তো আর কেউ নেই। তুমি করে বললে কেউ শুনে ফেলবে না তো?

শিলু তার বাহুতে হালকা একটা ধাক্কা দিল।

আপনি না!

আচ্ছা, আচ্ছা! রাগ করো না। কিন্তু একটা সমস্যা আছে।

কী সমস্যা?

এত দিন ধরে আপনি-আপনি করে বলার পর হঠাৎ তুমি বলতে গেলে আমার নিজেরই লজ্জা লাগবে।

রফিক এবার সরাসরি তার চোখের দিকে তাকাল।

কেন? আমি কি তোমার পর?

প্রশ্নটা খুব সাধারণ ছিল। কিন্তু তার কণ্ঠের ভেতরে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল, যা শুনে শিলুর মুখের হাসিটা ধীরে ধীরে নরম হয়ে এল।

সে আর মজা করল না।

কিছুক্ষণ রফিকের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু স্বরে বলল, না, তুমি আমার পর নও।

রফিক কিছু বলল না।

শিলু আবার বলল,

কথা দিলাম। আজ থেকে তোমাকে তুমি করেই বলব।

সত্যি?

সত্যি।

কথা দিলে কিন্তু!

কথা দিলাম। এবার কি রাজ্যের শান্তি ফিরে আসবে?

রফিক হেসে ফেলল।

হঠাৎ শিলু রফিকের হাতটা ধরে ফেলল।

রফিক একটু চমকে তার দিকে তাকাল।

কী হয়েছে?

শিলু উত্তর দিল না। বরং তার হাতটা আরও শক্ত করে ধরে রাখল।

কী হলো, মহারানী? হঠাৎ এত চুপ কেন?

শিলু এবার খুব নিচু স্বরে ডাকল,

মহাদেব...

রফিকের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

হুম, মহারানী?

শিলু কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে তার চোখের হাসিটা মুছে গেল। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল সামান্য। যে মেয়েটা কিছুক্ষণ আগেও হাসতে হাসতে রফিককে বিরক্ত করছিল, তার চোখে এখন অদ্ভুত এক ভয়।

রফিক সেই ভয়টা বুঝতে পারল না।

সে মৃদু হেসে বলল,

কী হয়েছে তোমার? এমন করে তাকিয়ে আছ কেন?

শিলু যেন কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। তার আঙুলগুলো রফিকের হাত আঁকড়ে ধরে আছে। চোখের কোণে জমে উঠেছে জল।

মহাদেব...

বলো, মহারানী। আমি শুনছি।

শিলু এবার কাঁপা কণ্ঠে বলল,

আমাকে ফেলে যেও না...

রফিকের হাসি থেমে গেল।

কী বলছ তুমি?

আমাকে ফেলে যেও না, মহাদেব। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না।

তার কণ্ঠে এমন এক অসহায় আকুতি ছিল, যেন সে এমন কিছু দেখতে পাচ্ছে, যা রফিক দেখতে পাচ্ছে না। যেন সামনে দাঁড়িয়ে

আছে এক অজানা বিচ্ছেদ, আর সেই বিচ্ছেদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে শেষবারের মতো রফিককে আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

রফিক তার হাতটা নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে বলল,

—আরে, আমি কোথায় যাব? এই তো আছি। কী হয়েছে তোমার?

কিন্তু শিলু যেন তার কথা শুনতেই পেল না।

—কথা দাও, মহাদেব। আমাকে একা করে দেবে না। কথা দাও, তুমি আমাকে ফেলে যাবে না...

রফিক কিছু বলতে যাচ্ছিল।

ঠিক তখনই চারপাশের দৃশ্য বদলে যেতে শুরু করল।

নদীর পানিতে প্রতিফলিত সোনালি আলো নিভে গেল। বাতাসের শব্দ থেমে গেল হঠাৎ। দূরের গাছপালা, নৌকা, আকাশ—সবকিছু কেমন ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল।

রফিক শিলুর হাত শক্ত করে ধরতে চাইল।

—শিলু!

কিন্তু তার হাতের ভেতর থেকে শিলুর হাতটা যেন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল।

—মহারানী!

শিলুর চোখে তখন শুধু ভয়।

সে শেষবারের মতো চিৎকার করে উঠল,

—মহাদেব... আমাকে ফেলে যেও না!

—শিলু!

রফিক চমকে উঠে বসে পড়ল।

ঘর অন্ধকার।

কয়েক মুহূর্ত সে বুঝতেই পারল না, কোথায় আছে। বুকের ভেতর হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। শ্বাস নিতে কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে।

সে চারদিকে তাকাল।

কোথাও নদী নেই। নেই বিকেলের সোনালি আলো, নেই কাশবন, নেই শিলু।

আছে শুধু পরিচিত ছোট্ট ঘরটা, বিছানার পাশে রাখা টেবিল, জানালার পর্দা আর দেয়ালে ঝোলানো পুরোনো ঘড়ি।

রফিক চোখ বন্ধ করল।

শিলুর শেষ কথাটা এখনো তার কানে বাজছে।

আমাকে ফেলে যেও না...

সে দুই হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে কিছুক্ষণ বসে রইল। নিজের মনকে বোঝানোর চেষ্টা করল, সবটাই স্বপ্ন। বাস্তব নয়। অথচ বুকের ভেতর যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, সেটাকে কোনো যুক্তি দিয়ে বোঝানো যাচ্ছে না।

ধীরে ধীরে মাথা তুলে সে দেয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকাল।

রাত ৩টা ১৭ মিনিট।

ঘড়ির কাঁটা নির্বিকারভাবে এগিয়ে চলেছে। পৃথিবীর কোথাও হয়তো কোনো মা তার সন্তানকে ঘুম পাড়িয়ে আবার চোখ বন্ধ

করেছেন, কোনো বাবা পরদিনের কাজের চিন্তা নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন, কোনো তরুণ নিজের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন।

আর রফিক?

সে এমন একজন মানুষের স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে, যার স্মৃতি থেকে সে আজও মুক্তি পায়নি।

রফিক দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নিজেকে স্বাভাবিক করার জন্য বিছানা থেকে নামল। টেবিলের ওপর রাখা গ্লাসে পানি ছিল। গ্লাসটা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে পানি পান করল। তারপর জানালার কাছে গিয়ে পর্দাটা একটু সরাল।

বাইরে ঘন অন্ধকার। দূরে দু-একটা বাড়ির উঠানে মৃদু আলো জ্বলছে। রাতের বাতাসে গাছের পাতাগুলো সামান্য নড়ছে। কোথাও কোনো মানুষের শব্দ নেই।

সবকিছু এত শান্ত, অথচ তার ভেতরে যেন এক অদৃশ্য ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

রফিক জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ তার চোখ পড়ল ঘরের এক কোণে রাখা পুরোনো কাঠের বাক্সটার দিকে।

বাক্সটা দেখতে খুব সাধারণ। কাঠের গায়ে সময়ের ছাপ পড়েছে, এক পাশে রং উঠে গেছে, ঢাকনার কোণেও পুরোনো দাগ। বহুদিন ধরে সেটি ঘরের ওই কোণেই পড়ে আছে। বাইরে থেকে দেখলে কেউ বুঝতেই পারবে না, বাক্সটার ভেতরে কতগুলো বছর জমা হয়ে আছে।

রফিক ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল।

বাক্সটার সামনে বসে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। হাত বাড়িয়েও সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনাটা খুলল না।

কারণ সে জানত, এই বাক্স খুললেই শুধু কিছু পুরোনো কাগজ বা ছবি দেখতে হবে না। খুলতে হবে নিজের মনের সেই দরজাটাও, যেটা সে প্রতিদিন বন্ধ রাখার চেষ্টা করে।

তবু শেষ পর্যন্ত নিজেকে আটকাতে পারল না।

ধীরে ধীরে ঢাকনাটা খুলল।

ভেতরে সযত্নে রাখা কয়েকটা চিঠি। কিছু পুরোনো ছবি। শুকিয়ে যাওয়া একটি ফুল, যার পাপড়িগুলো প্রায় বিবর্ণ হয়ে এসেছে। আর আছে একটি চকোলেটের মোড়ক—সময়ের সঙ্গে যার রং ফিকে হয়ে গেছে, কিন্তু রফিকের কাছে যার গুরুত্ব একটুও কমেনি।

বাক্সের ভেতর থেকে হালকা পুরোনো কাগজের গন্ধ ভেসে এল।

রফিক একটা ছবির দিকে হাত বাড়াল।

ছবিটা তুলে নিয়ে সে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইল। ছবিতে শিলুর মুখে সেই চেনা হাসি। চোখে দুষ্টুমি, ঠোঁটে অভিমান মেশানো মায়া।

মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ছবির ভেতর থেকে মুখ তুলে বলবে,

—কী হলো, মহাদেব? এমন করে তাকিয়ে আছ কেন?

রফিকের ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ফুটে উঠল।

সে ছবিটার ওপর আঙুল বুলিয়ে খুব নিচু স্বরে বলল,

—তুমি না, একদম আগের মতোই আছ, কুটি বউ। শুধু সময়টা বদলে গেছে।

কথাটা বলেই সে থেমে গেল।

সময় সত্যিই বদলে গেছে। যে দিনগুলোতে শিলুর সঙ্গে কথা বলার জন্য তার অজুহাত খুঁজতে হতো, যে বিকেলগুলোতে দুজনে পাশাপাশি বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত, যে ছোট ছোট অভিমান ভাঙানোর জন্য কত রকম কাণ্ড করতে হতো—সেসব এখন শুধু স্মৃতি।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, স্মৃতির ভেতরে শিলু আজও ঠিক আগের মতোই আছে।

তার হাসি বদলায়নি। অভিমান বদলায়নি। রফিককে মহাদেব বলে ডাকার ভঙ্গিটাও বদলায়নি।

বদলে গেছে শুধু তাদের বর্তমান।

রফিক ছবিটা হাতে নিয়েই কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর বাক্সের ভেতরে রাখা চকোলেটের মোড়কটার দিকে তাকাল। একসময় এই ছোট্ট জিনিসটাকে ঘিরেও কত আনন্দ ছিল! অন্য কারও কাছে এটি আবর্জনা ছাড়া কিছুই নয়। অথচ রফিকের কাছে এটি এমন এক দিনের সাক্ষী, যেদিন সামান্য একটা উপহারও পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস বলে মনে হয়েছিল।

সে মোড়কটা হাতে নিল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার আগের জায়গায় রেখে দিল।

তারপর ছবিটা বুকের কাছে ধরে খুব নিচু স্বরে বলল,